Bangladesh Journal of Political Economy

© 2017 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 33, No. 2, December 2017, pp. 235-264
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি ও পানি ব্যবস্থাপনায় অর্থনীতি ও নীতি-নৈতিকতা

(ভবদহ অঞ্চলের পর্যালোচনা)

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম*

সারকথা: *বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। কৃষি উৎপাদন মূলত প্রকৃতি প্রদত্ত তিনটি মৌলিক বিষয়ের উপর বেশী নির্ভরশীল; এগুলো হলো: মাটি, তাপমাত্রা/আলো এবং পানি। মাটি এবং তাপমাত্রা/আলোর উপর মানুষের হস্তক্ষেপ পানির তুলনায় কম। পানি ব্যবস্থাপনার উপর ফসলের উৎপাদন, উৎপাদন ব্যয় এবং কৃষক আর কৃষি অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি মৌলিকভাবে নির্ভরশীল। সমগ্র বাংলাদেশ তো বটেই দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পানি সম্পদের অব্যবস্থাপনার কারণে সৃষ্টি হচ্ছে লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা এবং নদী/খালের তলদেশ ভরাটজনিত সংকট। কৃষক এবং কৃষি পড়েছে হুমকির মুখে। এটি সত্যিকার অর্থে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মৌলিক আকাঙ্ক্ষা, ১৯৭২ এর সংবিধান এবং স্বাধীন বাংলাদেশের মৌল মানবিকতার সাথে সঙ্গতিহীন। সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি এবং পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভবদহের জলাবদ্ধতার বিষয়টিকে বিশেষভাবে বিবেচনায় আনা হয়েছে। এ প্রবন্ধে কৃষি ও পানি ব্যবস্থাপনার সাথে অর্থনীতি ও নীতি-নৈতিকতার দিকটি উপস্থাপন করা হয়েছে।*

১. ভূমিকা

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত্তি, উন্নয়নের সোপান। বাংলাদেশের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে যুক্ত। তাই, সঠিক নীতির প্রয়োগ আর যৌক্তিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে, এ দেশের মৌলিক কাঠামোগত ইতিবাচক এবং সুষম উন্নয়ন একমাত্র কৃষির মাধ্যমেই সম্ভব। এ ভূখণ্ডে কৃষি এবং সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের ইতিহাস সূপ্রাচীন। তবে, আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর কৃষি এখনো পরিপূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়নি। এ দেশে কৃষির উৎপাদন ব্যয় যথেষ্ট বেশী এবং সঙ্গতিহীন। কৃষি পণ্যের উৎপাদন এবং ব্যয় কাঠামো পানির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। কৃষিতে পরিকল্পিত পানি ব্যবস্থাপনা এখনও সত্যিকার অর্থে গড়ে ওঠেনি। প্রকৃতি-নির্ভরশীলতা এক্ষেত্রে মূলকথা। কৃষিতে যদি পরিকল্পিত পানি ব্যবস্থাপনা সম্ভব হতো তাহলে কৃষি পণ্যের উৎপাদন, চাষযোগ্য ভূখণ্ডের পরিমাণ বাড়তো, শস্য নিবিড়তা এবং উৎপাদিত

* সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, সরকারি ফুলতলা মহিলা কলেজ, খুলনা।

শস্যের পরিমাণ ইতিবাচক হতো। উৎপাদন ব্যয় কমতো, শক্তি সম্পদের অপচয় রোধ এবং জ্বালানী সাশ্রয় হতো। পণ্যের উৎপাদন ব্যয় কমতো, মান বাড়তো। কৃষি এবং কৃষকের উন্নয়নের সাথে দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উন্নয়ন সম্ভব হতে পারত। পানি ব্যবস্থাপনার অসঙ্গতি এ অঞ্চলের কৃষি এবং কৃষকের বঞ্চনা মহান মুক্তিযুদ্ধের মৌলিক চেতনা, সংবিধান এবং গণমানুষের মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে অপ্রত্যাশিত, নীতিশাস্ত্রের (Ethics) সাথে সঙ্গতিহীন। মূলত এ প্রবন্ধে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি ও পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভবদহ অঞ্চলের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২. কৃষি উৎপাদনে পানি ব্যবস্থাপনা এবং নীতিশাস্ত্র (Ethics)

এ দেশের সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা কৃষি জমির পরিপূর্ণ ব্যবহার হবে, উৎপাদনের উপকরণ, কলাকৌশল, প্রযুক্তি সহজ লভ্য হবে, পণ্য মূল্য জীবনমান উন্নয়নের সহায়ক হবে, কৃষির উন্নয়নের সাথে প্রজন্মের সামগ্রিক বিকাশের ধারা অব্যহত থাকবে এবং শক্তিশালী হবে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রণীত মূল সংবিধানের (১৯৭২) চার মূলনীতির মর্মবাণীও কৃষি-নির্ভর বাংলাদেশের উন্নয়নের নিরিখে প্রণীত। বাংলাদেশে মানব উন্নয়ন বা মানবিক মূল্যবোধের বিবেচনায় ও সব মানুষের কল্যাণের দিকটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মূলত কৃষি জমির পরিপূর্ণ ব্যবহার, কৃষিতে কৃষকের পরিপূর্ণ অধিকার, উৎপাদনের উপকরণে নিজের পরিপূর্ণ অধিকার, সঠিক পণ্যমূল্য প্রাপ্তির অধিকার, কৃষির উপর নির্ভর করে প্রজন্মের উন্নয়ন এবং বিকাশ সাধনের নিশ্চয়তা জরুরি। মাটি, পানির ব্যবহার কৃষি অর্থনীতির মৌলিক বিষয়। কৃষি বাংলাদেশের প্রধান অর্থনৈতিক খাত এবং পানি সম্পদের প্রধান ব্যবহারকারী। মূলত কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পানি সম্পর্কিত তিনটি বিষয় বিবেচ্য।

২.১. পরিমিত পানি: জলাবদ্ধতা এবং পানি স্বল্পতা বা শুষ্কতা উভয়ই কৃষি উৎপাদনের অন্তরায়। বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতির পরিকাঠামোতে এ সংকটটি বিদ্যমান।

২.২. উপযোগী পানি: কৃষি উৎপাদনের জন্য দরকার কৃষি উৎপাদন উপযোগী, গুণমান সম্পন্ন পানি। লবণাক্ততা এবং বেশী আয়রন সমৃদ্ধ পানি স্বাভাবিক কৃষি উৎপাদনকে ব্যাহত করে।

২.৩. সুষম পানি সরবরাহ: কৃষিতে সঠিক সময়ে চাষ এবং অধিক উৎপাদনের জন্য পানি সরবরাহ চ্যানেল বা ক্যানেল এবং এর সুষম ব্যবস্থাপনা খুবই জরুরি। এটি কৃষি, কৃষক এবং দেশের সঠিক উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক।

প্রশ্ন হলো, স্বাধীনতার ৪৮ বছর পরও বাংলাদেশের কৃষিতে পানি সম্পর্কিত মৌলিক তিনটি দিক অর্থাৎ পরিমিত পানি, উপযোগী পানি এবং সুষম পানি সরবরাহ প্রক্রিয়াটি গড়ে ওঠেনি। এ কারণে বাংলাদেশের কৃষক বছরের পর বছর জলাবদ্ধতা এবং খরার কারণে জমিচাষ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে বাধ্য হচ্ছে; লবণাক্ততা এবং আয়রনযুক্ত পানির কারণে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়েছে। সুষম পানি ব্যবস্থাপনা সংকটের কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে কৃষি উৎপাদন। সর্বোপরি, কৃষিতে পানি সম্পর্কিত এ তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতে কৃষি, কৃষক এবং কৃষি অর্থনীতিতে গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক দুর্নীতি, দূর্বৃত্তায়ন, কালো টাকার দৌরাত্ম, রেন্ট সিকারদের দৌরাত্ম, লুটপাট, শোষণ-বঞ্চনা, বৈষম্যের অপসংস্কৃতি যা চূড়ান্ত বিচারে বিচারহীনতার সংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে। এটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, আমাদের পবিত্র মৌলিক সংবিধান (১৯৭২) এবং মৌলমানবিক মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক যা কাম্য নয়।

৩. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিচিতি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল মূলত পলি মাটি দ্বারা গঠিত। এ অঞ্চলটা খুলনা বিভাগ কেন্দ্রিক। বলা যায় পদ্মা, মধুমতি, বলেশ্বর, সোনাই, ইছামতি, কালিন্দী, হাড়িয়াভাঙ্গা ও রায়মঙ্গল নদীর মধ্যবর্তী এলাকার ১০টি জেলা আর ঐতিহ্যবাহী চির সবুজ ঐশ্বর্য, অনুপম সৌন্দর্য-মণ্ডিত ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের অধিকাংশ নিয়েই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল। এর দক্ষিণাংশ নিচু ভূমি এবং লবণাক্ত, বাকী অধিকাংশ সমভূমি। কৃষি শস্যের মধ্যে আউশ-আমন ইরি-বোরো উৎপাদিত হয়। এছাড়া, এ অঞ্চল রবি শস্যসহ প্রায় সব শস্য উৎপাদনের উর্বর ক্ষেত্র।

৩.১. ভৌগলিক অবস্থান

খুলনা বিভাগ এর পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সীমানা, উত্তরে রাজশাহী বিভাগ, পূর্বে ঢাকা বিভাগ ও বরিশাল বিভাগ এবং দক্ষিণে বিখ্যাত ম্যানগ্রোভ বন নামে পরিচিত সুন্দরবনসহ বঙ্গোপসাগরের উপর তটরেখা রয়েছে। এটি নদীর দ্বীপ বা গ্রেটার বেঙ্গল ডেল্টার একটি অংশবিশেষ। অন্যান্য নদ-নদীর মধ্যে রয়েছে মধুমতি, ভৈরব ও কপোতাক্ষ। এছাড়াও অঞ্চলের বঙ্গোপসাগরের কয়েকটি দ্বীপ রয়েছে। পৃথিবীর মানচিত্রে খুলনা বিভাগের অবস্থান ২১°৪০ উত্তর অক্ষাংশ হতে ২৪°১২ উত্তর অংশে এবং৮৮°৩৪ পূর্ব দ্রাঘিমা হতে ৮৯°৫৭ পূর্ব দ্রাঘিমায়।

৩.২. মানচিত্র

৩.৩. জেলা উপজেলা, নদ-নদী ও জনসংখ্যা

জেলা	উপজেলা	নদ- নদী	জনসংখ্যা (২০১১আ: শু:)
চুয়াডাংগা	চুয়াডাংগা সদর, আলমডাংগা, দামুরহুদা, জীবননগর	পদ্মা, গড়াই, মাথাভাঙ্গা, মধুমতি, বলেশ্বর, কুমার,	১১,২৯,১১৫
মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর।	কাজলা, হরিণঘাটা, ইছামতি,	৬,৫৫,৩৯২
কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, কুমারখালী, খুকসা, মিরপুর, ভেড়ামার, দৌলতপুর	নবগঙ্গা, চিত্রা, কালিন্দি, কপোতাক্ষ, হাড়িয়াভাঙ্গা,	১৯,৬৪,৮৩৮
ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর, শৈলকুপা, হরিনাকুন্ডু, কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, মহেশপুর।	রায়মঙ্গল, শিপসা, ভদ্রা, খোলপেটুয়া, রূপসা, ভৈরব,	১৭,৭১,৩০৪
মাগুরা	মাগুরা সদর, মোহম্মদপুর, শালিখা, শ্রীপুর।	দড়াটানা, বাদুরগাছা, দেলুটি, সোনাই, মানকি, কাটাখাল,	৯,১৮,৪১৯
নড়াইল	নড়াইল সদর, লোহগাড়া কালিয়া	বেগবতি, বেতনা, বুড়িভৈরব,	৭,২১,৬৬৮
যশোর	যশোর সদর, বাঘারপাড়া, অভয়নগর, মনিরামপুর, কেশবপুর, ঝিকরগাছা, শার্শা, চৌগাছা।	আঠারোবেকি, আত্রাই, ফটকি, পশুর, মুক্তেশ্বরী, টেকা, শ্রী, গ্যাংরাইল ইত্যাদি	২৭,৬৪,৫৪৭
বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর, ফকিরহাট , মোল্লারহাট, চিতলমারী, কচুয়া, মোড়লগঞ্জ, শরণখোলা, রামপাল, মোংলা।		১৪,৭৬,০৯০
সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর, কলারোয়া, তালা, আশাশুনি, দেবহাটা, কালীগঞ্জ, শ্যামনগর।		১৯,৮৫,৯৫৯
খুলনা	রূপসা, তেরখাদা, দিঘলিয়া, ফুলতলা, ডুমুরিয়া, বটিয়াঘাটা, দাকোপ, পাইকগাছা, কয়রা,		২৩,১৮,৫২৭

৪. কৃষি উৎপাদনের সাথে পানি ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক

মূলত কৃষি পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে পানি ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি, জলাবদ্ধতা, ইত্যাদি যেমন জমি অব্যবহৃত থেকে যাওয়ার মূল কারণ অন্য দিকে পানির অপ্রতুলতা মাটির শুষ্কতাকে বৃদ্ধি করে, ফসল ধ্বংস হয়, পতিত জমির আধিক্য এর মৌলিক কারণ। এক পরিসংখ্যান দেখা যায় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বৃহৎ বিলগুলোতে ৪০% জমি বেশি নিচু। ফলে, জলাবদ্ধতার জন্য সঠিকভাবে চাষাবাদ করা যায় না। আবার ঐ একই বিলের উচু ৩০% জমিতে পানিস্বল্পতার জন্য আশানুরূপ ফসল হয় না। বাকী ৩০% মোটামুটি সুষম পানি ব্যবস্থাপনার অধীন। এ অবস্থায় সুষম পানি ব্যবস্থাপনা করতে পারলে সম্পূর্ণ জমি সঠিক চাষ উপযোগী করাসহ ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি সম্ভব।

পানি ব্যবস্থাপনার ধরন	বয়সভিত্তিক ফসল উৎপাদন (দিন)	ফসল নিবিড়তা	জমি ব্যবহারের হার
অপরিকল্পিত	২১০	১	৫৮%
আধা পরিকল্পনা/বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ	১৫০ + ১৮০	২	৯০%
পরিকল্পিত	৬৫ + ১২০ + ১৫০	৩	৯২%

৫. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের (৪টি জেলার) জমির কাঠামোগত বিন্যাস।

৫.১. জমির পরিমাণ (হেক্টর)

বিবরণ	খুলনা	বাগেরহাট	সাতক্ষীরা	নড়াইল	মোট
ক) মোট আবাদযোগ্য জমি	১৫১১৮০	১৪৯২৫৪	২২৯৬০৭	৭৮৩৬৬	৬০৮৪০৭
খ) আবাদী জমি (বর্তমান আবাদে আছে এমন জমি)	১৩৪১৮৮	১৪০৫৯৬	১৮৮৬২৬	৭৬৬০৬	৫৪০০১৬
গ) অনাবাদী জমি	২৪৯৭৬০	২৪৭৫৫৮	১৯৩১০৩	২০৯৪৫	৭১১৩৬৬
ঘ) স্থায়ী পতিত (আবাদযোগ্য কিন্তু আবাদে যায়নি)	২৫৭৫৭	১৫৫৬	৪০৯৮১	১০০৫	৬৯২৯৯
ঙ) জলাশয় (সাং বাৎসরিকভাবে পানির নিচে থাকে)	২২২৬৮	৪৮৩২	৩১৩৪	৩৪২২	৩৩৬৫৬
চ) স্থায়ী ফলবাগান	৯৩১৯	১৬২৫৭	৩২৩৮	২৭৩৯	৩১৫৫৩
ছ) স্থায়ী বনভূমি/বনাঞ্চল	১৬১৩৬৩	১৮৬৮৯১	১৩২২৬৫	২১০৪	৪৮২৬২৩
জ) শহর অঞ্চল	৪২০২	২৫৯৮	৬৩৩	৭৬৬	৮১৯৯
ঝ) বাড়ীঘর (গ্রামের)	২৩৪৩৩	২৪০১৪	৯২৭০	৮০৩০	৬৪৭৪৭
ঞ) রাস্তা অবকাঠামো ও অন্যান্য স্থাপনা	৩৪১৮	১২৫৯৮	৩৫৮২	২৮৭৯	২২৪৭৭
মোট (খ+গ)	৩৭৫১৮৩	৩৮৯৪৪৫	৩৮১৭২৯	৯৯৩১১	১২৪৫৬৬৮

৫.২. কৃষক পরিবারের সংখ্যা

বিবরণ	খুলনা	বাগেরহাট	সাতক্ষীরা	নড়াইল	মোট
ক) মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা	৩১০৪৭৪	২৪৪৯৭০	৩৮৫১৭৪	১৪১৪৬০	১০৮২০৭৮
খ) ভূমিহীন চাষী	৫৫৮৮৫	৩২৯৪৪	৬৭২৮৭	১১৬৭২	১৬৭৭৮৮
গ) প্রান্তিক চাষী	৯৬২৪৭	৭৪৯৯২	১৪৫৯০৫	৫২৬২৩	৩৬৯৭৬৭
ঘ) ক্ষুদ্র চাষী	৯৩১৪২	৮৫৬১৬	১১২৮৮৮	৫৬৬৫১	৩৪৮২৯৭
ঙ) মাঝারী চাষী	৫২৭৮১	৪১৫৬৭	৪৪৭৮১	১৬৯২৭	১৫৬০৫৬
চ) বড়চাষী	১২৪১৯	৯৮৫১	১৪৩১৩	৩৫৮৭	৪০১৭০

৫.৩. জমির পরিমাণ

বিবরণ	খুলনা	বাগেরহাট	সাতক্ষীরা	নড়াইল	মোট
নীট ফসলী জমি	১৩৪১৮৮	১৪০৫৯৬	১৮৮৬২৬	৭৬৮০৬	৫৪০২১৬
এক ফসলী জমি	৩৩৩০০	৬৬৯৬৮	৩৯৫২৩	১৩৮৮১	১৫৩৬৭২
দুই ফসলী জমি	৬৫১২৫	৫৪০৮০	১০৩০৬৩	৪২০৬৪	২৬৪৩৩২
তিন ফসলী জমি	৩৫৭৬৩	১৯০৬৩	৪৫০২৫	২০৯২১	১২০৭৭২
তিন ফসলের অধিক জমি	০০	৪৮৫	১০১৫	০	১৫০০
মোট ফসলী জমি	২৭০৮৩৯	২৩৪২৫৭	৩৮৪৭৮৪	১৬০৪৭২	১০৫০৩৫২
ফসলের নিবিড়তা (%)	২০২%	১৬৭%	২০৪%	২০৯.৪৭%	

৫.৪. কর্ষণ যন্ত্রের সংখ্যা

বিবরণ	খুলনা	বাগেরহাট	সাতক্ষীরা	নড়াইল	মোট
ট্রাক্টর	১৭	০	৬৬	৬৫	১৪৮
পাওয়ার টিলার	৩১৩৮	২৪৮৭	৪২১০	২৯৪৩	১২৭৭৮

৫.৫. আবাদ যোগ্য ভূমির শ্রেণিবিন্যাস (হেক্টর)

বিবরণ	খুলনা	বাগেরহাট	সাতক্ষীরা	নড়াইল	মোট
উচু জমি	৮১৮৩	২২২০৭	৫১৬৩৯	১৬০১০	৯৮০৩৯
মাঝারী জমি	১১৮৪৬৫	৭৩০২৩	১২৮২৫৭	৩১১২০	৩৫০৮৬৫
মাঝারী নিচু জমি	২১১৬৫	৪০৯৩০	২৭১৩৫	২০৭৩৪	১০৯৯৬৪
নিচু জমি	৩৩৬৭	১১১৬০	২২৫৭৬	৯২৩৯	৪৬৩৪৫
অতি নিচু জমি	০	১৯৩১	০	১২৬৩	৩১৯৪
মোট =	১৫১১৮০	১৪৯২৫৪	২২৯৬০৭	৭৮৩৬৬	৬০৮৪০৭

৬. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের (৪টি জেলার) প্রধান প্রধান শস্য বিন্যাস ও খাদ্য পরিস্থিতি

৬.১. শস্য বিন্যাস

ক্রঃ নং	শস্য বিন্যাসের বিবরণ			জমির পরিমাণ (হেক্টর)					বিন্যাসের শতকরা হার
	রবি মৌসুম	খরিপ-১	খরিপ-২	খুলনা	বাগেরহাট	সাতক্ষীরা	নড়াইল	মোট	
১	বোরো	পতিত	রোপা আমন	১৬৯০১	১৫৯০০	৬২২৫০	১৩০০০	১০৮০৫১	২০.৩৩%
২	বোরো	মাছ	মাছ	২০১২০	০	০	০	২০১২০	৩.৮০%
৩	বোরো	বোনা আমন		৬৬৫	২৩৮০	০	১১০০০	১৪০৪৫	২.৬৪%
৪	বোরো	আউশ	রোপা আমন	৭২৪	০	১৩৭৩০	০	১৪৪৫৪	২.৭২%
৫	বোরো	আউশ	পতিত	১৮৯৬	৪৩৪০	০	৩০০০	৯২৩৬	১.৭৩%
৬	বোরো	পতিত	পতিত	৩৮৭৯	২৬৫০০	১০০০	১৪০০০	৪৫৩৭৯	৮.৫৪%
৭	সরিষা	পাট	রোপা আমন	০	০	২৯১০	৩০০০	৫৯১০	১.১১%
৮	সরিষা	পতিত	রোপা আমন	৩৭০	৫২৫০	০	০	৫৬২০	১.০৫%
৯	ডাল জাতীয়	পাট	পতিত	০	০	০	৯০০০	৯০০০	১.৭০%
১০	ডাল জাতীয়	পাট	রোপা আমন	০	০	১৬৮০	৬০০০	৭৬৮০	১.৪৫%
১১	ডাল জাতীয়	পতিত	রোপা আমন	৩০৭	৯১৯০	০	০	৯৪৯৭	১.৮০%
১২	সবজি	সবজি	সবজি	৩৭৭৫	৩০৭০	৬২২০	২৫০০	১৫৫৬৫	২.৯৩%
১৩	পতিত	পতিত	রোপা আমন	২৩৫১১	৪২২৫০	১৮০৭০	০	৮৩৮৩১	১৫.৭৬%
১৪	পতিত	মাছ	রোপা আমন	২৭৩৫২	০	০	০	২৭৩৫২	৫.১৫%
১৫	পতিত	তিল	রোপা আমন	৯৬৪৬	০	০	০	৯৬৪৬	১.৮২%
১৬	পতিত	আউশ	রোপা আমন	৫০০	৪৫৪০	০	০	৫০৪০	১.০০%
১৭	অন্যান্য			০	১০৬৮৬	৫৩৪	৩৬০৭	১৪৮২৭	২.৮০%
১৮	জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার কারণে বর্তমানে আবাদ হচ্ছে না			০	০	৬০৫০০	০	৬০৫০০	১১.৩৮%

৬.২. খাদ্য পরিস্থিতি

বিবরণ	খুলনা	বাগেরহাট	সাতক্ষীরা	নড়াইল	মোট
ক) জনসংখ্যা	২৩৭৪৬৭৪	১৫০৪০৩৬	২০৪৮২৯০	৭৬০৭৩৩	৬৬৮৭৭৩৩
খ) খাদ্য প্রয়োজন (৪৮৭ গ্রাম/জন/দিন) মেঃটন	৪২২১১০	২৬৭৩৫০	৩৬৪০৯৪	১৩৪৬৫০	১১৮৮২০৪
গ) বীজ গো-খাদ্য ও অপচয় বাবদ- (খাদ্য প্রয়োজনের ১১.৫৮%) মেঃ টন	৪৮৮৮০	৪৪১১৯	৪২১৬২	৩১২২১	১৬৬৩৮২
ঘ) মোট খাদ্য চাহিদা	৪৭০৯৯০	৩১১৪৬৯	৪০৬২৫৬	১৬৫৮৭১	১৩৫৪৫৮৬
ঙ) মোট খাদ্য উৎপাদন (চাউল + গম)	৪৯৩২৫৩	৩৮০৯৯০	৫৯৩১৬৯	২৬৯৬১৪	১৭৩৭০২৬
চ) উদ্বৃত্ত(+) ঘাটতি(-) মেঃটন	+২২২৬৩	+৬৯৫২১	+১৮৬৯১৩	+১০৩৭৪৩	+৩৮২৪৪০

৭. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের (৪টি জেলার) সেচ ব্যবস্থাপনা

৭.১. ২০১৫-১৬ আমন মৌসুমে রোপা আমনে সম্পূরক সেচ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	রোপনকৃত জমি হেক্টর	ব্যবহৃত সেচ যন্ত্রের সংখ্যা										রোপা আমন চাষে অর্জিত জমি		মন্তব্য
			গভীর			অগভীর			এল এল পি			অন্যান্য	মোট জমির পরিমাণ (হেঃ)	সেচের আওতায় জমির পরিমাণ (হেঃ)	
			বিদ্যুৎ	ডিজেল	মোট	বিদ্যুৎ	ডিজেল	মোট	বিদ্যুৎ	ডিজেল	মোট				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	খুলনা	৯০৮৬০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৯০৮৬০	০	
২	বাগেরহাট	৬৪৬৬০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৬৪৬৬০	০	
৩	সাতক্ষীরা	৮২৫৯৫	৬	১৮	২৪	১২০	২২৩০	২৩৫০	০	৯০	৯০	০	৮৩৫৯৫	৪৮৩৫	
৪	নড়াইল	৩০৩১৫	০	০	০	২৫	৩২৫০	৩২৭৫	৩	৭১	৭৪		৩০৩১৫	৮৮০৫	
	মোট	২৬৯৪৩০	৬	১৮	২৪	১৪৫	৫৪৮০	৫৬২৫	৩	১৬১	১৬৪	০	২৬৯৪৩০	১৩৬৪০	

৭.২. ২০১৫-১৬ বোরো মৌসুমে বোরো ধানে সম্পূরক সেচ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	ব্যবহৃত সেচ যন্ত্রের সংখ্যা									অন্যান্য	সেচকৃত জমির পরিমাণ হেক্টর									অন্যান্য	সর্বমোট সেচকৃত জমি হেঃ
		গভীর			অগভীর			এল এল পি				গভীর			অগভীর			এল এল পি				
		বিদ্যুৎ	ডিজেল	মোট	বিদ্যুৎ	ডিজেল	মোট	বিদ্যুৎ	ডিজেল	মোট		বিদ্যুৎ	ডিজেল	মোট	বিদ্যুৎ	ডিজেল	মোট	বিদ্যুৎ	ডিজেল	মোট		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
১	খুলনা	৩	৬	৯	১৪৫৭	১৩৬৫০	১৫১০৭	১০	১৪২১০	১৪২২০	০	৫	১০	১৫	৩৪৫২	২৫৫৩৮	২৮৯৯০	৩৫	২২০৮০	২২১১৫	০	৫১১২০
২	বাগেরহাট	২	০	২	১৩৩৩	৪৫৫৩	৫৮৮৬	৩৩	১৪২২৩	১৪২৫৬	১৬৬০	৫৫	০	৫৫	৪৫৯৫	১০৮১৫	১৫৪১০	৩৪৫	৩৪৩৮০	৩৪৭২৫	৯৭০	৫১১৬০
৩	সাতক্ষীরা	৩৩৭	৪১০	৭৪৭	৩৫৯২	৫১১৮৫	৫৪৭৭৭	৩১	২৫১৫	২৫৪৬	১১৬০	৫৯৩৫	৫১২৫	১১০৬০	৯৪৯৩	৪৯১১৬	৫৮৬০৯	৬৩	৩৪৪৩	৩৫০৬	২৭০	৭৩৪৪৫
৪	নড়াইল	০	০	০	১২৯	১৭৯৫৫	১৮০৮৪	৩৭	৬২৫	৬৬২	০	০	০	০	৫০৫	৩৬২৫০	৩৬৭৫৫	৩০০	১৬২৫	১৯২৫	০	৩৮৬৮০
	মোট	৩৪২	৪১৬	৭৫৮	৬৫১১	৮৭৩৪৩	৯৩৮৫৪	১১১	৩১৫৭৩	৩১৬৮৪	২৮২০	৫৯৯৫	৫১৩৫	১১১৩০	১৮০৪৫	১২১৭১৯	১৩৯৭৬৪	৭৪৩	৬১৫২৮	৬২২৭১	১২৪০	২১৪৪০

৭.৩. ২০১৫-১৬ রবি মৌসুমে ফসলওয়ারী (বোরো ব্যতিত) সেচকৃত জমির পরিমাণ (হেক্টর)

ক্র: নং	জেলার নাম	গম	আলু	সরিষা	সবজী	ভুট্টা	ফলবাগান	পিয়াজ	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	খুলনা	৬৯০	৫০২	২৭৫	৫৪৮৬	৫০	০	৯৫	৩২	৭১৩০
২	বাগেরহাট	৫৩২	৫৯১	৪৬০	৩২৬২	১৬২	৮০৫	৯৩	৫৩৭	৬৪৪২
৩	নড়াইল	২১৩৩	৩৪৫৫	৮৯০৪	৯৭৫৫	১৬৫	৩০৫০	৬৫৫	২৮২২	৩০৯৩৯
৪	সাতক্ষীরা	৬৩০০	২০	২২৫০	২৩১৭	৩	২৫০	৫৯৫	৫২৫	১২২৬০
	মোট	৯৬৫৫	৪৫৬৮	১১৮৮৯	২০৮২০	১৮০	৪১০৫	১৪৩৮	৩৯১৬	৫৬৭৭১

৮. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের (৪টি জেলার) জলাবদ্ধ এলাকার চিত্র

ক্রঃ নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	জলাবদ্ধ এলাকার নাম	জলাবদ্ধ জমির পরিমাণ (হেঃ)	জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে আবাদী জমি উদ্ধার (হেঃ)	মন্তব্য
	খুলনা	তেরখাদা	ভুতিয়ার বিল।	৬১৭০	৬১৭০	আমন, বোরো, আউশ, শাকসবজী
		রূপসা	বড় জালা বিল, শিয়ালী বিল, নর্নিয়ার বিল, গোয়াড়া বিল, ডোবা বিল।	২০২৫	২০২৫	আমন, বোরো, আউশ, শাকসবজী
		ডুমুরিয়া	মাগুরঘোনা।	২২৫	২২৫	আমন, বোরো, আউশ, শাকসবজী
		মোট ঃ		৮৪২০	৮৪২০	
	বাগেরহাট	সদর	কাঠি, নোনাডাঙ্গা, সুলতানপুর, মুখক্ষাইট, কোড়ামারা, কুরশাইলচাপা, তলা, সৈয়দপুর, বড়পাইকপাড়া, খানপুর, হকিমপুর, বাদোখালী, পশ্চিমডাঙ্গা, সায়েড়া, শ্রীঘাট, হাড়িখালী।	২৩৮১	২৩৮১	
		ফকিরহাট	সাতবাড়িয়া, মৌভোগ, বারশিয়া, আট্টাকী, সাতশৈয়া, পিলজংগ, শ্যামবাগাত, খাজুরা, ভবনা, মাসকাটা, ঘনশ্যামপুর, তেকাটিয়া।	৮২০	৮২০	
		মোল্লাহাট	গাওলা, চকদা, মাটিয়াবগতি, কেন্দুয়া, সারুলিয়া, রাঙ্গামাটি, কাচনা, ধবলিয়া, মন্ডলগাতি, মোল্লারকুল, ঘাটবিলা, রাজপাট, গাংনী, বেতবাড়িয়া, কামরগ্রাম, আটজুড়ি, ভান্ডারখোলা।	২৭১০	২৭১০	
		রামপাল	গৌরম্ভা, কাপাস, মুরুলিয়া, প্রসাদ নগর, ভৈরবডাঙ্গা, আদাঘাট, আলুকাদিয়া, চিত্রা, সোনাকুড়, কদমদি, সোনাতুনিয়া,রাজনগর, পেড়িখালী, ভোজপাতিয়া, মল্লিকের বেড়, বাশতলি।	১৫৫৫০	১৫৫৫০	
		চিতলমারী	চিলতমারী, শিবপুর	১২৫	১২৫	
		মোট ঃ		২১৫৮৬	২০৭৬৬	
		সদর	বাঁশদহা, কুশখালী, বৈকারী, ঘোনা, শিবপুর, ভোমরা,			বোরো, রোপা আমন

চলতি পাতা

ক্রঃ নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	জলাবদ্ধ এলাকার নাম	জলাবদ্ধ জমির পরিমাণ (হেঃ)	জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে আবাদী জমি উদ্ধার (হেঃ)	মন্তব্য
	সাতক্ষীরা		আলীপুর, ধুলিহর, ব্রক্ষরাজপুর, আগরদাড়ী, ঝাউডাংগা, বল্লী, লাবসা, ফিংড়ী, পৌরসভা।	৬৫৮০	৬৫৮০	
		কলারোয়া	লাঙ্গলঝাড়া, রুদ্রপুর, মুরারীকাটি, গোবিনাথপুর, জালালাবাদ, জয়নগর, যুগিখালী, কশোডাংগা, দেয়াড়া	১৪৪৫	১৪৪৫	বোরো, রোপা আমন
		তালা	ধানদিয়া, নগরঘাটা, সরুলিয়া, খালিশখালী, তালা, তেতুলিয়া, জালালপুর, মাগুরা, ইসলামকাটি, কুমিরা।	১১৮৫০	১১৮৫০	বোরো, রোপা আমন
		আশাশুনি	কাদাকাটি, দরগাহপুর, কুল্যা।	৪৫০	৪৫০	রোপা আমন
		শ্যামনগর	আবাদচন্ডিপুর।	৮০	৮০	রোপা আমন
		মোট ঃ		২০৪০৫	২০৪০৫	
	নড়াইল	সদর	চাঁচুড়ি বিল, বেনাডোপ, বিজয়পুর, ঘড়িভাংগা, নলামারা, দুধপাতলা, কান্দর, শোলোয়ার বিল।	৮৫	৮৫	বোরো রোপা পদ্ধতিতে রোপা আমন
		লোহাগাড়া	ইছামতি বিল, কুমড়ি বিল/চাঁচুড়ি বিল।	২৫০	২৫০	বোরো রোপা পদ্ধতিতে রোপা আমন
		কালিয়া	যোগনিয়া, পাখিমারা, বি এফ কে পি বিল।	১৫০	১৫০	বোরো রোপা পদ্ধতিতে রোপা আমন
		মোট ঃ		৪৮৫	৪৮৫	
		অঞ্চলের মোট ঃ		৫০৮৯৬	৩৯২৭৫	

৯. জলাবদ্ধ ভবদহ প্রসঙ্গ

৯.১. ভবদহের পরিচিতি

ভবদহ, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি জলাবদ্ধ এলাকার নাম। এটি গাঙ্গেয় প্লাবন দ্বারা গঠিত, অপেক্ষাকৃত নবীন এবং নদী বিধৌত এলাকা। প্রকৃতঅর্থে, যশোর-খুলনা-সাতক্ষীরার সংযোগস্থল সংশ্লিষ্ট অঞ্চল। ভবদহ স্লুইসগেট সংশ্লিষ্ট যশোরের অভয়নগর, মনিরামপুর, কেশবপুর, খুলনার ফুলতলা, ডুমুরিয়া, সাতক্ষীরার তালা কেন্দ্রিক এর ব্যাপ্তি। গত শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে এলাকার নদীসমূহের প্রবল গতিপ্রবাহ ছিল। উজানের নদীসমূহের সাথে অবাধ সংযোগ ছিল বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত। অসুবিধা ছিল দিনে দুইবার জোয়ারের লবণাক্ত পানি, আর বন্যা। ঐ সময় পলি প্লাবন ভূমিতে পড়ে ভূমি গঠনের কাজ এবং নদীর প্রবাহ অক্ষুন্ন ছিল। ভূমি গঠন শেষ হওয়ার পূর্বেই উপকূলীয় বাঁধ তৈরি হয় (গত শতাব্দীর ৬০ এর দশকে) এবং উজানের প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। প্রত্যক্ষভাবে ২৭ বিল এবং পরোক্ষভাবে আরো ২৬ বিলের জল নিষ্কাশনের জন্য ১৯৬১ সালে ভবদহ স্লুইসগেটের জন্ম। প্রথমত: স্লুইসগেটের সুফল লক্ষণীয়। কিন্তু, পলি জমে ধীরে ধীরে ভরাট হতে থাকে নদীর তলদেশ। গত শতাব্দীর ৮০ এর দশকে দৃশ্যমান হয় জলাবদ্ধতা, এখন তার পরিণতি ভয়াবহ। মূলত ২৩টি ইউনিয়নের ২১৮টি গ্রাম এবং ৩৩০ বর্গ কি:মি: ভবদহের সংশ্লিষ্ট এলাকা বলা যায়। এ জলাবদ্ধতার কারণে বলা হচ্ছে ভবদহের বাঁধ মানুষের মরণ ফাঁদ। সমাধানের জন্য মুক্তির লড়াই হয়েছে। উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ভূক্তভোগী জনতা এবং সরকার। স্থায়ী সমাধান হয়নি। ভবদহের জলাবদ্ধতার জন্য এ এলাকার কৃষককূল দীর্ঘদিন কৃষিপণ্য উৎপাদন করতে পারছে না। সুষম পানি ব্যবস্থাপনার দ্বারা এখানে কৃষিপণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল করা সম্ভব।

৯.২. পটভূমি/প্রাককথন

বিশ্ব মানচিত্রে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি:মি: আয়তনের নদী মাতৃক ছোট দেশ, আমাদের ভূখণ্ড এ বাংলাদেশ। সুদূর অতীত ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ অঞ্চল প্রধানত পলিমটি-গঠিত ভূভাগ আর এর গঠন প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি। এ কথাও স্মরণযোগ্য যে, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল যেখানে আজ আমাদের অবস্থান, যা এক সময় সমুদ্র গর্ভে বিলীন ছিল। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে উজান থেকে আসা (বিধৌত) পলি মাটি বঙ্গোপসাগর অভিমুখে প্রবহমান, আবার জোয়ারকালীন এর উত্থিত গতির মিথষ্ক্রিয়ায় (জোয়ার-ভাটার চক্রাবর্তনে) নিপতিত পলি এ ভূ-খণ্ড সৃষ্টির ইতিকথা।

উল্লেখ্য, প্রতি বছর শুধুমাত্র সুন্দরবনের জৈববর্জ্য থেকে ৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন পলি তৈরি হয়ে এ অঞ্চলের নদ-নদী ও নদীতীরবর্তী ভূমিতে অবক্ষেপিত হয়। খুলনা, যশোর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, নড়াইল, ঝিনাইদহ, চুয়াডাংগা, কুষ্টিয়া, মাগুরা, জেলা নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল গঠিত (অবশ্য ফরিদপুর এবং বরিশালকে যুক্তকরে যে গঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চল যা গঙ্গাবিধৌত পলিদ্বারা গঠিত। প্রকৃত অর্থে, নদীসমূহের পলিবাহিত জোয়ার ভাটা, লবণাক্ত এবং স্বাদু পানি সমন্বিত এ অঞ্চল পৃথিবীর উর্বরতম অঞ্চল হিসেবে খ্যাত। ভৌগোলিক অবস্থান বিশ্লেষণে দেখা যায় ভারতের গঙ্গা, সে দেশের নদীয়া জেলার করিমপুর হয়ে বাংলাদেশের মেহেরপুরে প্রবেশ করে। গতিপথে মেহেরপুরের শোলমারী থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহমান। চলমান ধারায় পদ্মার শাখা ভৈরব–মাথাভাংগা মুক্তেশ্বরী, টেকা, শ্রী, হরি, তেলিগাতী নদী, গ্যাংরাইল ও শিবসা হয়ে কাংগার সাথে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে।

এখানে দুটো বিষয় সহজে জানা দরকার: (এক) গঙ্গা থেকে বঙ্গোপসাগরের এধারা এক সময় বাধাহীন ছিল জলাবদ্ধতা ছিল না। (দুই) এই ধারার প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় (যা পরের আলোচনায় সন্নিবেশিত) মুক্তেশ্বরী–টেকা-শ্রী হরী নদীর সংশ্লিষ্ট এলাকাই বর্তমানে সমস্যাগ্রস্ত ভবদহের জলাবদ্ধ অঞ্চল। মূলত ৬০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় পারামর্শ-উদ্বুদ্ধ সবুজ বিপ্লব কর্মসূচির আওতার অধিক ফসল ফলানোর কৌশলের অংশ হিসেবে ইউএসএ, আইডি'র সহায়তায় এবং এডিবি'র ঋণের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প। এ প্রকল্পের অংশ হিসেবে ৩৯টি পোল্ডার, ১৫৬৬ কিলোমিটার ভেড়িবাঁধ এবং ২৮২টি স্লুইসগেট দিয়ে ফসলের প্রলোভনে এ অঞ্চলের মানুষ ও তার প্রকৃতি পরিবেশকে দীর্ঘ মেয়াদী সংকটের যাতাকলে ফেলে দেয়া হয়।

অবশ্য উপকূল রক্ষা বাঁধ দেওয়া উষালগ্নে কয়েক বছর বাম্পার ফলন হয়। স্থানীয় কৃষকদের ভাষ্যমতে এ জন্য তারা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানকে সোনার কাচি উপহার দিয়েছিল। এরই মধ্যে প্রকৃতি প্রতিশোধ নিতে শুরু করে। বাঁধ দেয়ার ফলে পলি অবক্ষেপণের প্লাবন ভূমি আটকা পড়ল, ভূমি গঠন বাধাগ্রস্ত হলো। একদিকে কৃষি জমি হারাতে থাকল পলি অন্য দিকে জোয়ারে আসা এ পলি নদী তীর এবং তলদেশে জমা হতে থাকল। ফলশ্রুতিতে নদীর বুক উঁচু এবং বিলের তলদেশ সে তুলনায় নিচু থেকে গেল। বিলসমূহ পরিণত হলো পানির পকেটে। এ কারণে গত শতাব্দীর ৮০-এর দশকে মূলত ১৯৮২ সাল নাগাদ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের আড়াই লক্ষ হেক্টর কৃষি জমি স্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতার রূপ নেয়। ভবদহ অঞ্চলের ২৭টির অধিক বিল এবং প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ পড়ে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে। উল্লেখ্য অভয়নগর, কেশবপুর, মনিরামপুরের কৃষি জমির সঙ্গে সংলগ্ন শ্রী-হরি নদীকে দুই ভাগ করে, ভবদহ নামক স্থানে ২১ ভেন্ট ও ৯ ভেন্টের দুইটি স্লুইসগেট দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে মুক্তেশ্বরী, হরিহর, ভদ্রা ও কপোতাক্ষ নদীর জল অপসারিত হয়।

বিলের হিসাব বিশ্লেষণ করলে প্রত্যক্ষভাবে ২৭টি এবং পরোক্ষভাবে আরো ২৬টি বিলের পানি নিষ্কাশিত হতো এ ভবদহ স্লুইসগেট দিয়ে। প্রকৃতির নিয়মে স্লুইসগেটের ভাটিতে পলি জমতে থাকে সর্বোপরি, ২০০৫ সালে টানা ৪৮দিন ভবদহ স্লুইসগেট বন্ধ থাকে, সংকট আরো ঘনিভূত হয়। আসলে প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিকে বাধা দিলে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়। ভাটিতে পোল্ডার স্লুইসগেট ও বাঁধ নির্মাণ, উজানে নদীর প্রবাহ ক্ষীণ করা, কোথাও কোথাও অবকাঠামো নির্মাণ দ্বারা নদীর গতি বন্ধ করা হয়েছে। প্রকৃতির গতিকে রোধ করা হয়েছে। আর প্রকৃতির প্রতিশোধই হচ্ছে ভবদহের বর্তমানের দীর্ঘস্থায়ী ও ভয়াবহ জলাবদ্ধতা।

৯.৩. সম্পর্কিত পরিভাষা

ক) ক্রুগ মিশন: একথা অস্বীকার করার উপায় নেই খাল বিল জল জলা, জঙ্গল জানোয়ারের সাথে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের জীবনাচার, জীবিকার নিবিড় সম্পর্ক আর বন্ধন সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে। বাস্তবতা হলো এ জল যখন স্থায়ী অস্থায়ী জলাবদ্ধতার রূপ পরিগ্রহ করে জীবন জীবিকা তখন দুর্বিসহ, মুক্তির লড়াই তখন অনিবার্য এ অঞ্চলের প্রধান সমস্যা ছিল বন্যা আর লবণাক্ততা। এর সমাধানের প্রয়াস চলেছে, বছরের পর বছর। ১৯৫৪-৫৫ সালের ভয়াবহ বন্যার পর জাতিসংঘের সুপারিশে পূর্ববাংলার বন্যা সমস্যা সমাধানের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয় যা ক্রুগমিশন নামে খ্যাত। ক্রুগমিশন এ অঞ্চলের বন্যা সমস্যার সমাধানের জন্য একটা সুপারিশ পেশ করেন।

খ) অষ্টোমাসী বাঁধঃ গতশতাব্দীর চল্লিশের দশকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকেরা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিলে ফসল করার উদ্দেশ্যে, বাঁধ দিয়ে লোনা পানি ঠেকিয়ে আবাদ করতেন। আবাদ শেষে বাঁধ কেটে জোয়ারের পলিযুক্ত পানি বিলে তুলে বিল উঁচু করতেন। এভাবে চলত ফসল উৎপাদনের সাথে ভূমি গঠন। আর এ বাঁধের নাম অষ্টমাসী বাঁধ। মাঘী পূর্ণিমার বাঁধ দিয়ে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় খুলে দেয়া হতো। এতে নদীর নাব্যতা বজায় থাকত। নদী দিয়ে পানি সহজে নিষ্কাষিত হওয়ায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হতো না।

গ) পোল্ডারঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদী বেষ্টিত ভূমির নদী তীর বরাবর চতুর্দিকে বাঁধ নির্মাণ করে নদীর লবণাক্ত পানি বিলে প্রবেশের পথ বন্ধ করা হয় এবং বিলের ভিতরে অবস্থিত খালের মুখে স্লুইস গেট নির্মাণ করে বিলের ভিতরের আবদ্ধ পানি নিষ্কাষণের পথ সুগম করা হয় যা পোল্ডার নামে অভিহিত। ১৯৫৯ সালে সাবেক ইপি. ওয়াপদা গঠন হওয়ার পর এ লবণ পানি বাধা দেওয়া এবং অধিক ফসল ফলানোর জন্য দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের কর্মকাণ্ড শুরু হয়।

ঘ) জোয়ারধার (TRM)ঃ TRM এর পূর্ণরূপ Tidal River Management বাংলার নদীর জোয়ার ব্যবস্থাপনা। মূলত জলাবদ্ধতা নিরসন, ভূমি গঠন ও নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিতে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদের উদ্ভাবিত নদী পরিচর্যার সমন্বয়ে ফসল ফলানোর এক কৃষি পদ্ধতি যা পরবর্তীতে গবেষকদের সমর্থনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মর্যাদা পেয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় জোয়ার ভাটা চলমান মূল নদী সংলগ্ন যে কোন উপযুক্ত বিলে তিন দিকে পেরিফেরিয়াল বাঁধ দিয়ে নদী সংলগ্ন অবশিষ্ট দিকের উপযুক্ত স্থান উন্মুক্ত করে জোয়ার ভাটা চালু রাখা। ফলে জোয়ারের সময় পলিযুক্ত পানি বিলে প্রবেশ করে পলি অবক্ষেপণ করবে। পরে ভাটার সময় স্বচ্ছ পলি নদী দিয়ে সাগরে ফিরে যায় এ প্রক্রিয়ায় বিল উঁচু এবং নদী খনন কাজ সম্পন্ন হয়। এতে ভূমি গঠন ও নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পাবে জলাবদ্ধতা দূর হবে।

ঙ) পেরিফেরিয়াল বাঁধঃ একটা বিলে পরিকল্পিত জোয়ারাধার (টিআরএম) সৃষ্টির লক্ষে তিন দিকে বাঁধ দেয়া এবং একদিকে খোলা রেখে জোয়ারের সময় পলিযুক্ত পানি তোলা এবং ভাটিতে স্বচ্ছ পানি বের করে দেয়া। উদ্দেশ্য হলো পলিযুক্ত লবণ পানি বাইরে না যায়। কারণ, এ পানি বাইরে গেলে প্রাণী ও প্রকৃতির ক্ষতি হবে। দ্বিতীয়ত, পলিমাটি যা জমিতে পড়ে উঁচু হবে এবং স্বচ্ছ পানি বের হয়ে নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি করবে।

চ) কাটিং পয়েন্টঃ পেরিফেরিয়াল বাঁধের যে দিকটা খোলা রাখা হবে, জোয়ারের পানি (পলিযুক্ত) বিলে প্রবেশ এবং পলিবিহীন স্বচ্ছ পানি বের করার জন্য সেই দিকটাকে কাটিং পয়েন্ট বলে।

৯.৪. ভবদহ সংশ্লিষ্ট নদীপ্রবাহ (গঙ্গা থেকে বঙ্গোপসাগর)

মুক্তেশ্বরী নদী ভৈরবের দক্ষিণমুখী শাখা গঙ্গা বিধৌত ব-দ্বীপের এই প্রধান প্রবাহ ভৈরব। নদীয়া জেলার করিমপুর থানা দিয়ে মেহের পুরের শোলমারী থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বে প্রবাহমান। গঙ্গানদীর এর প্রধান উৎস। ৫০-এর দশকে বাংলাদেশ থেকে ৩কি.মি দূরে ভারতের অভ্যন্তরে হাগনা গাড়ি নামক স্থানে বাঁধ দিয়ে এই নদীর প্রবাহ স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়। চূর্ণী নদীর সাথে এই প্রবহের সংযোগ।

পদ্মার শাখা মাথাভাংগা ভৈরবের আর এক প্রবাহ মুখ। উল্লেখ্যে, ইংরেজরা মাথাভাংগা নদীর উৎপত্তি স্থলে মাটি বোঝাই নৌকা ডুবিয়ে মাটি ভরাট করায় এর স্রোত অনেকটা ক্ষীণ। মাথা ভাঙ্গা সুবলপুর-রঘুনাথপুরে ভৈরবের সাথে মিশে বুড়ি ভৈরব নামে গতিশীল গভীর নদী। কোটচাঁদপুরের তাহেরপুর-হাকিমপুর থেকে কপোতাক্ষ ভাগ হলে ভৈরব আবার ক্ষীণ হয়ে পড়ে। বুকভরা বাওড় থেকে হালসার খাল কেটে হরিহরে মিশলে ভৈরব ও মুক্তেশ্বরীতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

মুক্তেশ্বরীর উৎপত্তি ভৈরব থেকে। যশোর কালীগঞ্জ চৌগাছার বিস্তৃত এলাকার বিশাল বাওড় মজ্জাতের বাওড়ের বিপরীত পাশে মুক্তাধা নামক স্থান থেকে প্রবাহমান ভৈরবের দক্ষিণ পাশ থেকে মুক্তেশ্বরীর উৎপত্তি। সুদীর্ঘ ও এককালের খরস্রোতা এখন মৃত প্রায়। যশোর শহর ও ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণপাশ দিয়ে সতীঘটা মনিরামপুর উপজেলায় প্রবেশ করে। ঢাকুরিয়া পার হয়ে ডুমুর বিলের ভিতর দিয়ে সম্বন ডাঙ্গা বিলের পাশ দিয়ে পাঁচবাড়িয়া মুক্তেশ্বরী কলেজ ও হাজির হাটের বাজারের উত্তর পাশ দিয়ে লেবুগাতী হয়ে বিল বোকড়ে প্রবেশ করে অভয়নগর ও মনিরামপুরের সীমানা বরাবর মশিয়াহাটী, কুল্টিয়া ও লখাইডাঙ্গার পাশ দিয়ে বিল কেদারিয়ায় প্রবেশ করে। হেলার ঘাট ও লখাইডাঙ্গার ব্রিজের নিচ দিয়ে এর অবস্থান। টেকার ব্রিজ পেরিয়ে ভবদহ স্লুইসগেটে টেকা নদী নামে এসে মিশেছে শ্রী ও হরি নদীর সাথে। অতীতে ভৈরব, হরিহর ও কপোতাক্ষের বহু মিলন ধারার অস্তিত্ব থাকলেও বর্তমানে আমডাঙ্গার খাল (২০০৬ এ নতুন করে স্বেচ্চাশ্রমে কাটা) ছাড়া তার কোনো সংযোগ নেই।

ভবদহের ভাটিতে মুক্তেশ্বরী হরি নদী নামে খুলনা ডুমুরিয়া ও যশোর কেশবপুরের সীমানা বরাবর প্রবাহমান। নিচের অংশে তেলিগাতী নদী, গ্যাংরাইল ও শিবসা হয়ে কাংগার সাথে সাগরে মিলেছে। হরিহরের নিম্নমুখী অন্য ধারাটি আপার সালতা হয়ে ঝপঝপিয়া ও কাকবাছা নদীর দুই ধারা নিয়ে পশুর নদীর সাথে মিশে মালঞ্চের সাথে সাগরে মিলেছে।

মুক্তেশ্বরীরর দুই পাড়ে অসংখ্য গ্রাম ও হাট-বাজার। যশোর শহরের পর (যশোর শহর মূলত ভৈরবের দুই পাড়) সতীঘাটা, ঢাকুরিয়া, উত্তরপাড়া, বারপাড়া, সুবলাকাঠি, ভোমরদহ, কাটাখালি, হাজরাইল, পাচবাড়িয়া, পাচকাটিয়া, কুমারসীমা, লেবুগাতী, ১৮ পাকিয়া, সুন্দলী, পোড়াডাঙ্গা, মশিয়াহাটী, কুলাটিয়া, লখাইডাঙ্গা, বালিধা, পাচাকড়ি, বারান্দী, দামুখালী, দত্তগাতি, ভবদহের পরে কপালিয়া, মান্দ্রা, দহাকুলা, শোলগাতিয়া, আগরহাটি, ভায়না, খর্ণিয়া, শোভনা প্রভৃতি।

৯.৫. "ভবদহের জলাবদ্ধতা আর সংশ্লিষ্ট নদীসমূহের গতি পথের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য"

একটা বিষয় খুব পরিস্কার বোঝা দরকার, আমাদের উজানে হিমালয় আর ভাটিতে বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল তো বটেই এর মাঝখানের প্রায় সমগ্র ভূভাগ জলরাশি/নিম্নভূমি থেকে নদী বাহিত পলি দ্বারা গঠিত। বলা যায় নদীর বুক থেকে এবং নদী বাহিত পলি দ্বারা এ ভূখণ্ডের জন্ম, আর এ অর্থে নদী হলো জননী। তাই বলা হয়, নদীমাতৃক বাংলাদেশের মানুষ নদীসমূহের নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহ ভূমিগঠন এবং প্রকৃতির নিয়মে জলাবদ্ধতা নিরসনে ভূমিকা রাখে। এর ব্যত্যয় হলে মানুষ এবং প্রকৃতিতে বিরূপ প্রভাব পড়ে। এ প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট নদীসমূহের উৎপত্তি ও গতিপথ বিশ্লেষণ দরকার। আমরা বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণে দেখি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীসমূহ মূলত ভৈরব- মাথাভাংগা নদীকাঠামোরই অংশ।

মূলত উপরোক্ত নদীগুলোর জলপ্রবাহ বাধাহীন হলে ভবদহসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হবে না। নদীগুলোর প্রবাহহীনতাই আজকের জলাবদ্ধতার মৌলিক বিষয়।

৯.৬. জলাবদ্ধতার কারণ জানতে যে বিষয়গুলো ভাবা দরকার

ক) জলাবদ্ধতার জনক উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে বিশ্ববাজার ভাগাভাগীর পরিপ্রেক্ষিতে বহুবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে ক্রুগমিশনের রিপোর্ট স্থগিত হয়। পূর্ব বাংলায় বন্যা সমস্যার সমাধানের দায়িত্বে নিযুক্ত হয় ওয়াপদা সংস্থা। ওয়াপদা পূর্ব বাংলার বন্যা সমস্যা তদন্তপূর্বক লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশকে অন্যতম প্রধান

উৎপত্তিস্থল	নদ-নদী/নদ-নদীসমূহ
ভৈরব এবং মাথাভাঙ্গা	ইছামতি, বেত্রাবতী (বেতনা), কপোতাক্ষ, হরিহর, মুক্তেশ্বরী, ভদ্রা, চিত্রা, বেগবতী, ফটকী, কাজলা, নবগঙ্গা
তাহিরপুর, চৌগাছা, যশোর	কপোতাক্ষ-ভৈরবের শাখা
ঝিকরগাছা, যশোর	হরিহর-কপোতাক্ষের শাখা
ত্রিমোহিনী, কেশবপুর, যশোর	ভদ্রা-কপোতাক্ষের শাখা
মহেশপুর, ঝিনাইদহ	বেত্রাবতী-ভৈরবের শাখা
কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ, যশোর সদর ও চৌগাছা উপজেলা সংলগ্ন মজ্জাতের বাওড়ের দক্ষিণ প্রান্ত	মুক্তেশ্বরী-ভৈরবের শাখা
দর্শনা	চিত্রা ভৈরবের শাখা
মথুরাপুর, ঝিনাইদহ	বেগবতী/ফটকী নদী, নবগঙ্গার শাখা
চুয়াডাঙ্গা শহরের পাশে মাথাভাঙ্গা	নবগঙ্গা
ভৈরব, কপোতাক্ষ, মুক্তেশ্বরী ইত্যাদির নিম্নপ্রবাহ।	খোল পেটুয়া, আড়পাঙ্গাসিয়া, শিবসা, মরিচ, হরি, শ্রী, গ্যাংরাইল, শোলমারী, ময়ুর।

সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে। সর্বোপরি, গত শতাব্দীর ষাটের দশকে সাম্রাজ্যবাদীরা সেচ, সার, বীজ, কীটনাশক বিক্রির বিশ্ববাজার সৃষ্টির লক্ষে, সবুজ বিপ্লবের নামে অধিক শস্য ফলাও শ্লোগানকে সামনে নিয়ে আসে। জোয়ারের লবণ পানি প্রতিরোধে উপকূল জুড়ে বেড়ী-বাঁধ এবং স্লুইসগেট প্রকল্পের ফর্মূলা উপস্থিত করে। এই ফর্মূলার প্রেক্ষিতে ১৯৬০-৬৭ সালের মধ্যে শুধু খুলনা অঞ্চলে ৩৪টি পোল্ডার ১৫৬৬ কি.মি. বেড়ি-বাঁধ ও ২৮২টি স্লুইসগেট নির্মাণ করা হয়। উপকুল জুড়ে এ পোল্ডার ভেড়ি বাঁধ আর স্লুইসগেট নির্মাণের ফলে বিল অভ্যন্তরে লোনা পানি প্রবেশ বন্ধ হয়। সবুজ বিপ্লবের শ্লোগানে কৃষি উৎপাদন কিছুটা বাড়ে। শুরু হয় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। জোয়ারের পানির সাথে সাথে আগত পলিও বিলের ভিতর প্রবেশে বাঁধাগ্রস্ত হয়। বন্ধ হয়ে যায় পোল্ডারের ভিতরের নিচু জমির ভূমি গঠন প্রক্রিয়া। এ পলি প্লাবনভূমি না পেয়ে জমা হতে থাকে নদীর তলদেশে। অন্য দিকে উজানের জল প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে উজান থেকে প্রবহমান নদীসমূহ প্রবাহহীন হয়ে পড়ে। ফলে লবণ পানির প্রবাহ এবং পলিপ্রবাহ উজানে অনেক দূর পর্যন্ত ঢুকে পড়ে, শুরু হয় পরিবেশ বিপর্যয় এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক নদীর তলদেশ, বিলের তলদেশের তুলনায় উঁচু হয়ে যায় নিষ্কাশন পথ

বন্ধ এবং নেতিবাচক পথ ধরে সমায়ান্তে জলাবদ্ধতার কবলে পড়ে ভবদহসহ তৎসংলগ্ন অঞ্চল।

খ) বাধাগ্রস্ত উজানের প্রবাহ

এক: গঙ্গা বিধৌত ব-দ্বীপের এ অংশের প্রধান প্রবাহ ভৈরব। যা ভারতের নদীয়া জেলার করিমপুর থানা দিয়ে মেহেরপুরের শোলমারী থেকে বংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বে প্রবহমান। মূলত গঙ্গা নদীই এর প্রধান উৎস। গত শতাব্দীর ৫০ এর দশকে বাংলাদেশ থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে ভারতের অভ্যন্তরে হাগনাগাড়ি নামক স্থানে বাঁধ দিয়ে এই নদীর প্রবাহ স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়। চুর্নী নদীর সাথে এই প্রবাহের সংযোগ।

পদ্মার শাখা, মাথা ভাংগা ভৈরবের আর এক প্রবাহ মূখ। ইংরেজরা মাথা ভাংগা নদীর উৎপত্তি স্থলে মাটি বোঝাই নৌকা ডুবিয়ে মাটি ভরাট করার ফলে এর স্রোত কিছুটা ক্ষীণ হয়। মাথা ভাংগা সুবলপুর রঘুনাথপুরে ভৈরবের সাথে মিশে বুড়ি ভৈরব নামে গতিশীল গভীর নদী। কোটচাঁদপুরের তাহেরপুর হাকিমপুর থেকে কপোতাক্ষে ভাগ হলে ভৈরব আবার ক্ষীণ হয়ে পড়ে। ফলে এর ভাটিতে মুক্তেশ্বরী তার দুর্বল প্রবাহ নিয়ে টেকা শ্রী-হরি গ্যাংরাইল নামে বঙ্গোপসাগরের অভিমূখে প্রবাহিত। এর দুর্বল প্রবাহ ভবদহ অঞ্চলের পানি প্রবাহের ক্ষেত্রে তেমন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সমর্থ নয়।

দুই: অবকাঠামো নির্মাণে নদীর উপর হস্তক্ষেপ: ১৮৫৯ সালে আসাম-বাংলা রেললাইনের কাজ শুরু হয়। ১৮৬১ সালে কোলকাতা থেকে কুষ্টিয়ার জগতি পর্যন্ত ১৭০ কিলোমিটার রেললাইন স্থাপনের কাজ শেষ হয়। রেললাইনটি স্থাপন করা হয় চিত্রা নদীর পূর্ব তীর বরাবর। এ সময় চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ভৈরব নদের ওপর একটি সংকীর্ণ রেলসেতু নির্মাণ করা হয়। এরপর ১৯৩৮ সালে চিত্রার খাত পুরোপুরি ভরাট করে কেরু অ্যান্ড কোম্পানী চিনিকল নির্মাণ করা হয়। ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সব নদ-নদীতে গঙ্গার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। এরপরও দর্শনার রেলসেতুর নিচ দিয়ে সামান্য পরিমাণ পানি আসতো। কিন্তু ১৯৬০ সালে জিকে প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং মাগুরায় নবগঙ্গা নদীর ওপর একটি স্লুইসগেট নির্মাণের কারণে তাও বন্ধ হয়ে যায়।

৯.৭. সমস্যা যেভাবে শুরু

আশির দশকের শুরুতে স্লুইসগেটের বাইরে পলি জমে বাঁধের বাইরের নদী ও ভেতরের নদী ভূমি থেকে উঁচু হয়ে যায়। নাব্যতা হারায় মুক্তেশ্বরী, টেকা, শ্রী ও হরি নদী। অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে পানি নিষ্কাশনের পথ। বৃষ্টির পানি আটকা পড়ে সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা। ১৯৮৪ সাল থেকে এই জলাবদ্ধতা প্রকট আকার ধারণ করে। বৃষ্টির পানি বিলে আটকা পড়ে পরে তা উপচিয়ে বিল সংলগ্ন গ্রামগুলো প্লাবিত হয়। পানিবন্দী হয়ে পড়েন মানুষ। পানি সরানোর দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন ভুক্তভোগী মানুষ। আন্দোলনের মুখে তৎকালীন সরকার ১৯৯৪ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) ২৫৭ কোটি আর্থিক সহায়তায় শুরু করে খুলনা-যশোর নিষ্কাশন পুনর্বাসন প্রকল্প (কেজেডিআরপি)। ২০০২ সালে প্রকল্পের কাজ শেষ হয়। শ্রী, হরি ও টেকা নদীর পলি অপসারণ, খাল খনন এবং বিল কেদারিয়ায় জোয়ারাধার নির্মাণ করা হয় এই প্রকল্পের আওতায়। আপাত অবসান হয় জলাবদ্ধতার।

২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্থানীয় বিএনপি নেতা বর্তমানে মনিরামপুর উপজেলার নেহালপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নজমুস সাদাতসহ আরও ৪৮৩ ব্যক্তি বিল কেদারিয়ায় জোয়ারাধার বন্ধের জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের নির্দেশে পানি উন্নয়ন বোর্ড মার্চ মাস থেকে ৪৮ দিন ভবদহ স্লুইসগেট বন্ধ রাখে। এতে পলি জমে নদীর বুক উঁচু হয়ে পড়ে। ওই বছরের অক্টোবর মাসের টানা বর্ষণে পুনরায় পানি জমে জলাদ্ধতা দেখা দেয়। এরপর ২০০৬ সালের চারদফা অতিবর্ষণে অভয়নগর, মনিরামপুর, কেশবপুর ও যশোর সদর উপজেলার ২১টি ইউনিয়নের ১৮৪টি গ্রাম তলিয়ে যায়। পানিবন্দী হয়ে পড়েন চার লক্ষাধিক মানুষ। পানি সরানোর দাবিতে 'ভবদহ পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটির' নেতৃত্বে শুরু হয় দুর্বার আন্দোলন। তীব্র আন্দোলনের মুখে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ওই বছর ৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে শ্রী, হরি ও টেকা নদী পুনর্খনন করা হয়। কেশবপুর উপজেলার বিল খুকশিয়ায় জোয়ারাধার চালু এবং অভয়নগর উপজেলার আমডাঙ্গা খাল সংস্কার করা হয়। শুরু হয় পানি নিষ্কাশন। দূর হয় জলাবদ্ধতা।

৯.৯. ভবদহসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে টিআরএম

TRM (Tidal River Management) মূলত মূল নদী সংলগ্ন যে কোন একটি নির্বাচিত (একাধিকও হতে পারে) বিলের তিন দিকে পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ করে (উন্মুক্তও হতে পারে) অবশিষ্ট দিকের ভেড়িবাঁধের একটি অংশ উন্মুক্ত করে পরিকল্পিতভাবে বিলে জোয়ার ভাটা চালু করা হয়। এটাই টিআরএম বা জোয়ারধার নামে পরিচিত। এ পদ্ধতিতে সাগর থেকে জোয়ারের সাথে আসা পলি বিলে থেকে যায়। পরে স্বচ্ছ পানি ভাটি আকারে ফিরে যায়। ফলশ্রুতিতে জোয়ারে আসা পলি বিল/নিম্নভূমি উঁচু করে আর ফিরে যাওয়া স্বচ্ছ পানির প্রবাহ নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করে প্রকৃতির নিয়মে নদী খনন কাজ চলে। এভাবে ভূমিগঠন জলাবদ্ধতা নিরসন এবং নদী খনন কাজ সম্পন্ন হয়।

ক) অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ এর সমীক্ষা: ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় ১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গ প্রলয়ংকারী বন্যায় কবলিত হয়। সেই সময়ের বিদ্যমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের স্বনামধন্য অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ একটি সমীক্ষা প্রকাশ করেন। তার সেই সমীক্ষায় বন্যার কারণ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়। এ সমীক্ষায় ঐ বন্যার প্রবণতা, বন্যা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বাঁধের কার্যকারিতা সম্পর্কেও দিক নির্দেশনা ছিল। প্রায় ১০০ বছর আগে ১৯২৭ সালে তিনি বললেন, "উত্তরবঙ্গের বন্যার প্রধান কারণ সেখানকার বিলসহ নিচু এলাকায় পানি ঢুকলে সহজে বের হতে পারে না। বন্যার প্রবাহকে দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার পথ করে দেয়াটাই হচ্ছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পন্থা।" প্রশান্ত মহলানবীশ তার বিশ্লেষণে আরো বলেন পলিযুক্ত পানি অবাধে চলতে দিলে পলির স্তর পড়ে নিচু ভূমি ক্রমাংশ উঁচু হয়ে উঠবে, বন্যার প্রকোপ কমবে। এ প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ, সেকারণে নিকট ভবিষ্যতে বন্যা হতে থাকবে। সমাধান সূত্রে তিনি বললেন, নদীর তীরে বাঁধ তৈরি করে বন্যাকে ঠেকানোর প্রচেষ্টা কোন স্থায়ী সমাধান নয়। কারণ এতে আবদ্ধ বন্যার জলে সঞ্চিত পলিমাটি পড়ে নদীতল ক্রমে ভরাট ও উঁচু হয়ে যাবে। অর্থাৎ নিচু এলাকায় চারিদিকে বাঁধ নির্মাণ দীর্ঘমেয়াদী সমাধান নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদে জল নিষ্কাশনের পথে বাধা সৃষ্টি করবে। উল্লেখ্য, অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ এর তথ্য (উত্তরবঙ্গে বন্যা সম্পর্কিত) আমাদের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতার কারণ ও সমাধানের সাথে অনেকটা সংগতিপূর্ণ।

৯.৮. ভবদহের জলাবদ্ধ এলাকার মানচিত্র

(ক) সংশ্লিষ্ট পোল্ডারসমূহ

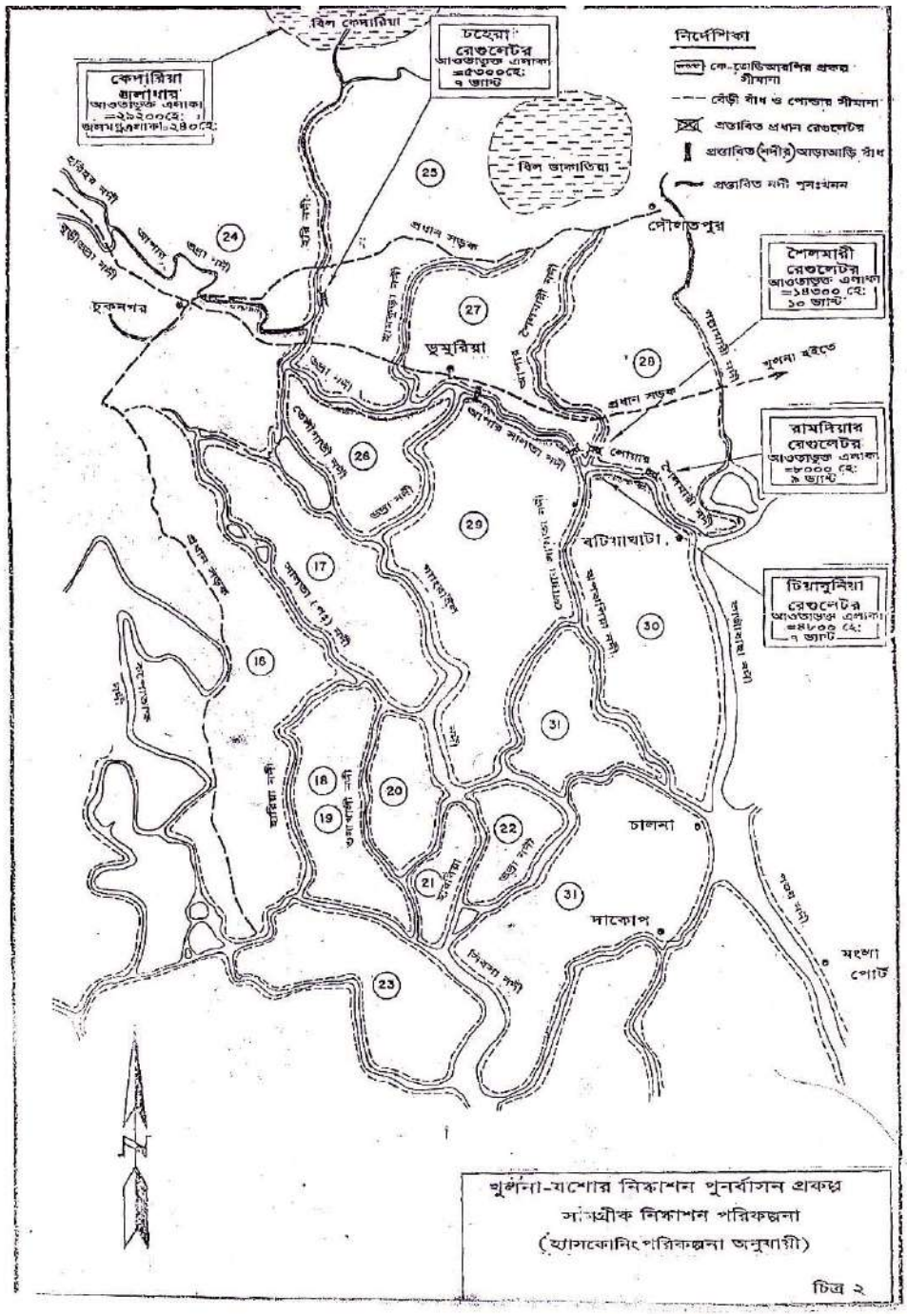

৯.৮. ভবদহের জলাবদ্ধ এলাকার মানচিত্র
(খ) ২৪ নং পোল্ডার (জলাবদ্ধ)

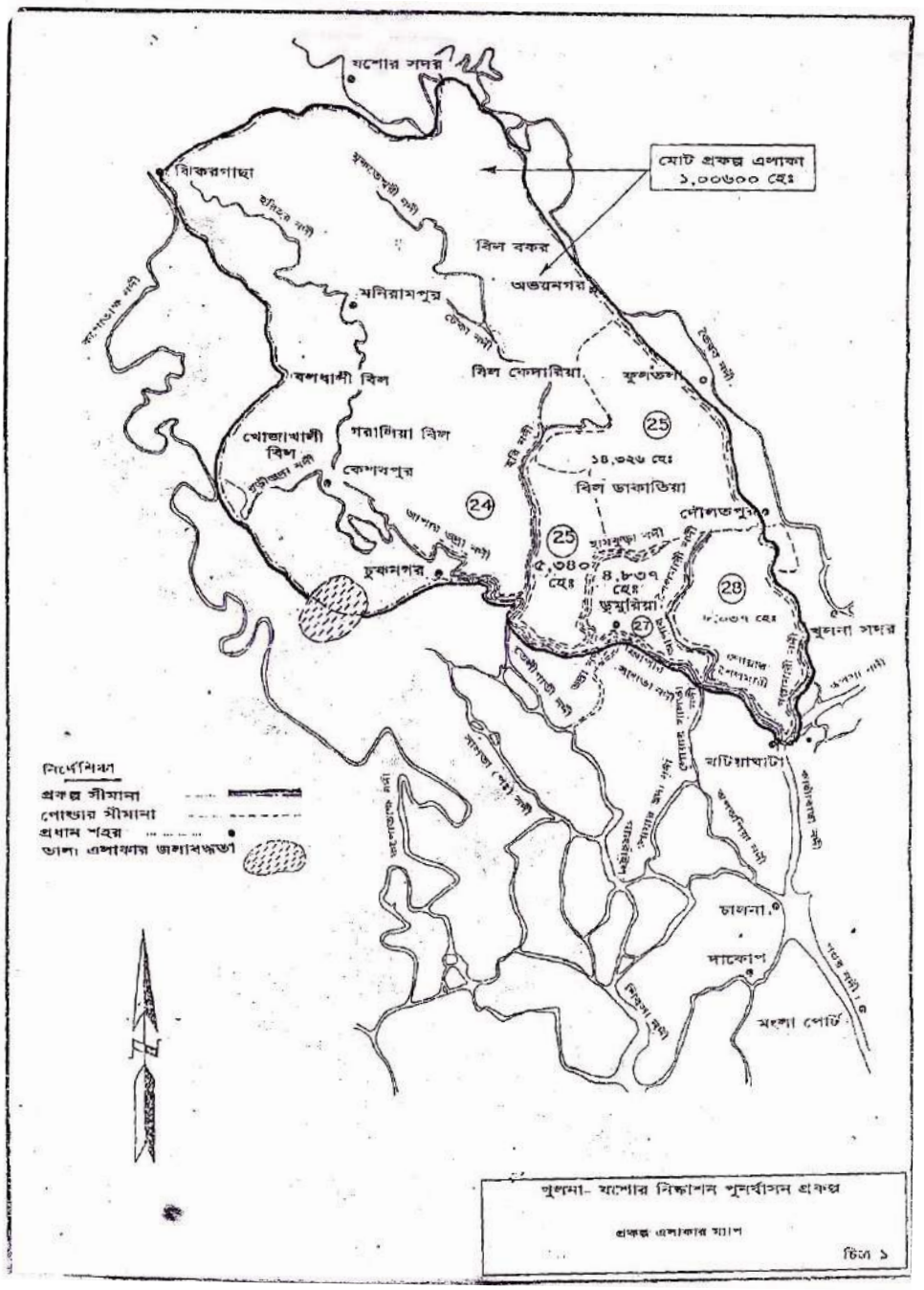

খ) টিআরএম এর স্বীকৃতি: আসলে অতি প্রাচীন লোকজ জ্ঞানের প্রতিষ্ঠানিক রূপ টিআরএম। গত শতাব্দীর ৮০ দশকের শুরুর দিকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতা শুরু হলে, তা নিরসনের লক্ষে ভিন্ন ভিন্ন নামে আন্দোলনকারী সংগঠনসমূহ (এ আন্দোলনের প্রায় সবগুলোর পুরোধায় ছিল বাম প্রগতিশীল সংগঠন ও ব্যাক্তি) বাঁধ কাটা, গেট ভাংগা অবাধ পানি প্রবাহের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়। এ প্রেক্ষিতে ১৯৯৪-৯৫ সালে এডিবি-ইউএনডিপি এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে (২২,৮৬৮,১৬ লক্ষ টাকা) কেজিডিআরপি (Khulna Jessore Drainage and Rehabilitation Project) এর অধীন হ্যাসকোনিং ও হেলক্রো সামগ্রিক নিস্কাশন পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। এ কর্মসূচির আলোকে পানি উন্নয়ন বোর্ড সাবেক উপকুলীয় বাঁধের সম্প্রসারণ করতে চাইলে গণপ্রতিরোধে তা বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৯৯৭ সালের ৯ সেপ্টেম্বর যশোর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে ইজি আই এস-এর জাতীয় কর্মশালায় পানি বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বসহ সর্বস্তরের জনগণ গবেষণালব্ধ ৪টি বিকল্পের মধ্যে ৪র্থ নম্বরের নদীর পরিকল্পিত জোয়ার ভাটা ব্যবস্থাপনা যা বর্তমানে টিআরএম এর স্বীকৃতি দেয়।

সময়	বিল	কার্যক্রম
১৯৮৩	ভর্তের বিল/ সিঙ্গিয়ার বিল	বাঁধ ভাঙ্গা
২২ জুলাই, ১৯৮৮	ডহুরী	বাঁধ কাটা
১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০	বিল ডাকাতিয়া	বাঁধ কাটা
২৯ অক্টোবর, ১৯৯৭	ভরত-ভায়না	বাঁধ কাটা

গ) টিআরএম পূর্ব বাঁধকাটা/ভাঙ্গা কার্যক্রম (বিক্ষুব্ধ জনতা/আন্দোলনকারী সংগঠন)

ঙ) টিআরএম এর ব্যর্থতার কারণ

১। হীন রাজনৈতিক স্বার্থ (টিআরএম এর পক্ষে বিপক্ষে অবস্থান)
২। খাস জমি ও পরিত্যাক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতা।
৩। টিআরএম এর বিরুদ্ধে ঘের মালিক ও লীজ গ্রহীতাদের অবস্থান।
৪। পানি উন্নয়ন বোর্ডের দায়িত্বহীনতা, দুর্নীতি এবং বোর্ডের প্রতি জনগণের অনাস্থা।
৫। পানি উন্নয়ন বোর্ডের দক্ষতা এবং আন্তরিকতার অভাব।
৬। পেরিফেরিয়াল এবং গ্রামরক্ষা বাঁধ সংক্রান্ত প্রশ্ন।
৭। ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রাপ্তিতে ব্যাপক হয়রানি, অব্যবস্থাপনা এবং সীমাহীন দুর্নীতি।

ঘ) এ পর্যন্ত বাস্তবায়ন/চলমান টিআরএম এর খতিয়ান

বিলের নাম	সংশ্লিষ্ট নদ-নদী	ধরন (মুক্ত/পরিকল্পিত)	সময়কাল	কততম	উদ্যোক্তা	ক্ষতিপূরণ	প্রধান অন্তরায়/ পরিবেশের উপর প্রভাব	মূল্যায়ন
ভরত ভায়না	হরিনদী	অপরিকল্পিত, উন্মুক্ত	১৯৯৭, ২৯ অক্টোবর থেকে ২০০১	১ম	আন্দোলন কারী স্থানীয় জনগণ	ব্যবস্থা ছিল না।	গাছপালা, মাছ, প্রকৃতির ক্ষয়ক্ষতি। লবণাক্ততার ফলে গো-খাদ্যের সংকট	বিলের তলদেশ ৫-৬ ফুট ভরাট, ৭৫% ভরাট, হরিনদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পায়।
বিল কেদারিয়া (৬০০ হেক্টর)	হরিনদী	পরিকল্পিত (৬০০ হেক্টর জমির চারিদিকে পেরিফেরিয়াল বাঁধ ছিল)	জানুয়ারি ২০০২ থেকে জুন ২০০৪ পর্যন্ত	২য়	পানি উন্নয়ন বোর্ড	ব্যবস্থা ছিল না।	পরিবেশের উপর তেমন বিরুপ প্রভাব ছিল না। ২০০৫ সালে উঁচু অংশের জমির মালিকেরা জমির চাষ করে, নিচু অংশ নিচু থেকে যায়। আরও কিছুদিন টিআরএম দরকার ছিল। কিন্তু হয়নি। ২/৩ অংশ ভরাট হয়। অভ্যন্তরীন দ্বন্দ শুরু হয়। সামগ্রিক ক্ষতি ভবদহ অঞ্চলের নদী ১৭ কিলোমিঃ পলি দ্বারা ভরাট হয়। ফলে ২০০৫ সালে জলাবদ্ধতা হয়।	হরি নদীর নাব্যতা বজায় ছিল।
পূর্ব বিল খুকশিয়ায় (৮৪৬ হেক্টর)	হরিনদী	পরিকল্পিত	২৭ এপ্রিল ২০০৬ থেকে ২০১০+	৩য়	পানি উন্নয়ন বোর্ড	ব্যবস্থা ছিল।	ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু সবাই পায়নি। ১০৮২ জন জমির মালিকের মধ্যে ৪৪৬ জন ক্ষতি পূরণ পেয়েছে। ক্ষতিপূরণ বাবদ ১,৮৫,২৩,৩৩২/- (এক কোটি পঁচাশি লক্ষ তেইশ হাজার তিনশত বত্রিশ) টাকা মাত্র। (পানি উন্নয়ন বোর্ড ফসলের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩,৪০,০০,০০০/- (তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ করেন।	নির্ধারিত সময়ে টিআরএম কার্যক্রম শেষ না হওয়ায় জনমনে নানা প্রশ্নের জন্ম হয়। টিআরএম করা কালীন সংশ্লিষ্ট বিলে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয়া দরকার।

৯.১০. ভবদহের চলতি জলাবদ্ধতায় ক্ষয়ক্ষতির হিসাব

উপজেলার নাম	মোট ইউপির সংখ্যা	অধিক ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নের নাম ও সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা (বর্গকিঃমিঃ)	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার	ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত ঘর বাড়ি (সম্পূর্ণ/আংশিক)
মনিরামপুর	১৭টি	ঢাকুরিয়া, হরিদাসকাঠি, খেদাপাড়া, হরিহরনগর, ঝাপা, মশ্বিমনগর,চালুয়াহাটি, শ্যামকুড়, খানপুর, দুর্বাডাঙ্গা, কুলটিয়া, নেহালপুর, মনোহরপুর = ১৩টি	১২০টি	২০৬.০০	৩০,০০০	১,২০,০০০	১,৫০০
অভয়নগর	০৮টি	প্রেমবাগ, সুন্দলী, চলশিয়া, পায়রা = ৪টি পৌর = ১টি	৫৫টি	১২০.০০	১৪,৮৯৫	৬৫,০০০	১৪,৮৯৫
কেশবপুর	১১টি	কেশবপুর সদর = ১টি পৌর = ১টি	৮৫টি	১২১.৯০	১৭,৩৪৯	৮২,৫১১	১৭,৩৪৯

অস্থায়ী/স্থায়ী আশ্রয় কেন্দের সংখ্যা	আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রিত পরিবার	ফসলের ক্ষয়ক্ষতি সম্পূর্ণ (হেক্টর)	আংশিক (হেক্টর)	টাকায় ক্ষতি	ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য সম্পদ হেক্টর	টাকায় ক্ষতি	ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ	মন্দির/শ্মশ্মান	ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক (পাকা/কাঁচা)
৪২টি	৪০০০টি	৪১৫২.০০	৬৫৩৭.০০	৬৭৬.৩৫ কোটি	৭০১৩	১৯৪.০০ কোটি	২৪টি	০৮টি	৪৫কিঃ মিঃ
২৬টি	৭২০টি	৫৭৫৩.০০	-	৬০.৬৫ কোটি	৩৫০০	১২৪.০০ কোটি	১১টি	২০টি	৩৩কিঃ মিঃ
২০টি	২৩২৯টি	৫,৩০০	৩৯৪				৩০টি	১০টি	৪৪.৪৬কিঃ মিঃ

ক্ষতিগ্রস্থ বাধ	ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রাথমিক	মাধ্যমিক	মাদ্রাসা	কলেজ	ক্ষতিগ্রস্ত মোট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপ (গভীর/ অগভীর)	ক্ষতিগ্রস্ত স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন	ক্ষতিগ্রস্ত জলাধার পুকুর	ঘের/ বাওড়/ হ্যাচারী (হেক্টর)	ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটি ক্লিনিকট	মৃতের সংখ্যা
০১ কিঃ মিঃ	৫১টি	৩৬টি	০৮টি	০৬টি	১০১টি	১২০টি	১৮০০০	৬০০০	২৫০০	০৮টি	০৭জন
-	২৭টি	০৮টি	০৩টি	০২টি	৪০টি	৫০টি	৪০০০	৪৫০০	৩৫০০	-	১২জন
	৭০টি	৪০টি	৩০টি	৮টি	১৪৮টি	২০৮টি	৯৮৩	১,১১৩	২,৯৪৭		৩জন

৯.১১. জলাবদ্ধ এলাকায় চলমান আর্থ-সামাজিক সংকট ও অভিঘাত

সংকট	অভিঘাত
স্যানিটেশন ব্যবস্থা নষ্ট	দূষণের বিস্তার
দুষিত জল	চর্মরোগের প্রাদূর্ভাব
জলাবদ্ধ বসতভিটা	সাপসহ বিষাক্ত পোকামাকড়ের আক্রমণ
ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপ	পানীয় জলের সংকট
গো-খাদ্যের অভাব	গবাদি পশু কমমূল্যে বিক্রি/স্থানান্তর
জলাবদ্ধ কমিউনিটি ক্লিনিক	চিকিৎসার সমস্যা
বন্ধ স্কুল, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ঝরে পড়ার আশংকা
দীর্ঘমেয়াদী জল	ইরি-বোর চাষের অনিশ্চয়তা
কৃষিজ ফসল (ধান, পাট, শাক-সবজি আবাদ নষ্ট)	পেশার পরিবর্তন
জলাবদ্ধতা নিরসনের উদ্যোগ	দূর্নীতির মহোৎসব
ত্রাণ বিতরণ (যৎসামান্য)	সুদখোর বেসরকারি সংস্থার অনুপ্রবেশ
হাইওয়ে রাস্তায় জল ও জলযান (খুলনা-যশোর, নওয়াপাড়া-মনিরামপুর, নওয়াপাড়া-মশিয়হাটী)	পরিবহন ও যোগাযোগ সংকট, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, দীর্ঘমেয়াদী ভোগান্তির আশংকা
উন্মুক্ত (জল, জলা, জলজ সম্পদ)	জলজ সম্পদ (মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদি), খাস জমির দখলদার, বড় ভূ-স্বামীদের পুনঃদখল
কারেন্ট জালের বিস্তার	জলজ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত
বনজ সম্পদ ধ্বংস	পরিবেশ বিপর্যয়
গবাদি পশু, মানুষ, খাবার ঘর যৌথ (রাস্তার উপর)	দূর্বল আত্মিক ও সামাজিক বন্ধন
জ্বালানী সংকট	খাদ্যের অনিশ্চয়তা
কর্মহীনতা	হাহাকার
বসতভিটাসহ শেষ সম্বল নষ্ট	শহরমূখী প্রবণতা, বস্তিয়ায়নের আশংকা

৯.১২. আশু করণীয়

১। চলমান স্কেভেটর এর কার্যক্রমে গতি আনয়ন।
২। নতুন করে অধিক স্কেভেটরের এর ব্যবস্থা করা।
৩। স্কেভেটর বন্ধ না রেখে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করা।
৪। উত্তোলিত পলি তীরে না রেখে দুরে অপসারণের ব্যবস্থা, ফলে নদীতে পুনরায় গড়িয়ে পড়ার হার কমবে।
৫। ভবদহের ২১ ও ৯ গেটের মাঝ দিয়ে ভবদহের উজান এবং ভাটির সরাসরি সংযোগ স্থাপন।
৬। আমডাংগা খালের সংস্কার করা।
৭। নিহালপুরের দাইয়ের খাল সংস্কার ।
৮। মনিরামপুরের দুর্বাডাঙ্গার বাকার খাল সংস্কার করতে হবে।

৯। উভয় পাশের জল প্রবাহ সংযোগের যে পুল-ব্রিজ ছিল তার উভয় পার্শ্বের প্রবাহ নিশ্চিত করা।
১০। বিল অভ্যন্তরের নিষ্কাশন খালসমূহ বাধাহীন করা।

৯.১৩. স্থায়ী সমাধান/সুপারিশ/যা ভাবতে হবে

প্রকৃতপক্ষে ভবদহের জলাবদ্ধতার সমাধান একক কোন পদ্ধতি বা কৌশলে সম্ভব না। মূলত টিআরএম এবং বাধাহীন উজানের জলপ্রবাহ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ভাবনাগুলো হলো:

১। পরিকল্পিত এবং সর্বোচ্চ দক্ষতার সাথে পর্যায়ক্রমে এলাকার সব বিলে টিআরএম বাস্তবায়ন করা।
২। টিআরএম-কে নিরবিচ্ছিন্ন করা। মূলত একটা টিআরএম শেষ না হতেই অন্যত্র তা চালু করার ব্যবস্থা করা।
৩। আমডাংগা খাল সংস্কারের মাধ্যমে সংকটের সহায়ক নিষ্কাশন পথ তৈরি করা।
৪। মাথা ভংগা, ভৈরবের সাথে মুক্তেশ্বরী ও কপোতাক্ষসহ ভাটির সব নদীর অবাধ প্রবাহ সৃষ্টির নিশ্চিত ব্যবস্থাপনা।
৫। জলাবদ্ধ এলাকাকে ঘিরে জল প্রবাহ সার্কেল তৈরি করা। সংশ্লিষ্ট সব নদী, খাল সংস্কার (কৃত্রিম এবং প্রাকৃতিক উপায়ে) এবং পরস্পরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন।
৬। কৃত্রিম সব বাঁধ, বাধা অপসারণ করা। প্রাচীন নিয়মে প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়া।
৭। মৌলিকভাবে ভূমি কৃষি, জল-জলা সংস্কার (টিআরএম চলাকলীন সংশ্লিষ্ট বিলে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম)
৮। নদী খনন, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে জল প্রবাহ পরিকল্পিতকরণ।
৯। উজানে ব্যারেজ নির্মাণ করে জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ।
১০। উজানের জলপ্রবাহ পর্যাপ্ত এবং নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক নদীসমূহের প্রশ্নে জাতীয় নীতি নির্ধারণ ও
কার্যক্রম পরিচালনা।
১১। ভবদহ, কাটেঙ্গাঁ, জামিরা, বিল ডাকাতিয়া, আফিল জুট মিল এবং জাহানাবাদ ক্যান্টনমেন্ট এর মাঝ বরাবর গিলাতলা সংলগ্ন ত্রিমোহনা (ভৈরব- মুজতখালী) সংযোগ চ্যানেল তৈরি।
১২। পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বাস্তবমুখী জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং সঠিক বাস্তবায়ন।
১৩। ভূমি, কৃষি, জলা সংস্কার ।
১৪। নদী, খাল-বিলে পরিকল্পিত ও অভিন্ন প্রবাহ সৃষ্টি করা।

১০. উপসংহার

আমাদের উজানে হিমালয় আর ভাটীতে বঙ্গোপসাগর। মধ্যবর্তী পললভূমি আমাদের আবাসন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে একেবারে নির্মূল করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। ঝুঁকি কমানোর কৌশল বের করা সম্ভব মাত্র। সম্ভবত বাংলাদেশে ১২৩/১২৫টি পোল্ডার আছে। মূলত লবণাক্ততা, জোয়ার-ভাটা এবং জলোচ্ছ্বাস থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে এর জন্ম। আর জলাবদ্ধতার গোড়ার কথাও এখানে। শুধু বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল নয়, পোল্ডারভূক্ত প্রায় সর্বত্র এ জলাবদ্ধতার সংকট বিদ্যমান। গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শুরুতে আলোচিত ভবদহ এবং ঐ সংলগ্ন এলাকায় সংকটের উত্থান, আশির দশকে বিকাশ আর সম্প্রতি এর চরম পরিণতি। প্রতি বছর মোটামুটি ২৪০ কোটি টন পলি এ ভূ-খণ্ডে উজান এবং ভাটী থেকে প্রবাহিত এবং নিপতিত হয়। অবশ্য বাংলাদেশে রেইন কাট পলির বিষয়টি ভাবলে বলা যায় বন্যা এবং বৃষ্টির তারতম্যে এর হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। এর ব্যবস্থাপনা মূখ্য বিষয়। প্রকৃতির কাছে ফিরে গিয়ে প্রকৃতির নিয়মে দিনে দুই বার (জোয়ার ভাটা) প্লাবন ভূমিতে এ পলির বিক্ষেপন যেমন ভূমি গঠন করবে, স্বচ্ছ পানি ফেরার পথে নদীর প্রবাহ সচল রাখবে। এর ব্যত্যয় হলে নদীর, খালের তলদেশ ভরাট হবে। এর প্রমাণ মাত্র দেড় মাসে ভবদহের স্লুইসগেটের ভাটিতে ১৫ কিঃ মিঃ পলি দ্বারা ভরাট হওয়া। এর বিকল্প কি? যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পলি ব্যবস্থাপনা নদীর সংস্কার তা তৃতীয় বিশ্বের দেশ বাংলাদেশে কতটুকু সম্ভব ভাবনার বিষয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের নদীসমূহ মূলত দক্ষিণ-পূর্বমূখী আর এর পলি ১০০% মিহি প্রায় কাঁদা যুক্ত (উল্লেখ্য দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের নদী দক্ষিণ-পশ্চিমমূখী এবং তার পলি খসখসে পাথরকুঁচি যুক্ত)। প্রাকৃতিক নিয়মে এর অপসারণের জন্য জলপ্রবাহ বেগবান হওয়া জরুরি। গতি ঘন্টায় নূন্যতম ৩ কিলোমিটার। উজানের প্রবাহ বন্ধ থাকায় এটা ব্যাহত হচ্ছে। সেটি আর একটা বড় প্রশ্ন। সংকট উত্তরণে টিআরএম-ই ভরসা। তবে এ ব্যবস্থা সাময়িক। চূড়ান্ত সমাধানে শুধু দরকারই নয়, ভূমি কৃষি, জল, জলা, জঙ্গলে মৌলিক ব্যবস্থাপনা এবং যৌক্তিক সংস্কার নিশ্চিত জরুরি। এর জন্য চাই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত-রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এর কোন বিকল্প নেই।

তথ্যসূত্র

১। আবুল বারকাত, 'বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি' মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ২০১৬।

২। আবুল বারকাত, 'বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি জলা সংস্কার: দূর্বৃত্তবেষ্টিত কাঠামোতে সবচেয়ে অমীমাংসিত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিষয়'।

৩। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, অতিরিক্ত পরিচালক, খুলনা অঞ্চল, খুলনা।

৪। কৃষক, ক্ষেতমজুর, সংগ্রাম পরিষদ, খুলনা-যশোর সমন্বয় কমিটি, 'জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে বিকল্প ভাবনা ও প্রস্তাবনা'।

৫। অনিল বিশ্বাস সম্পাদিত, 'একটি ছোট্ট অপারেশন দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বহুবিধ সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম'।

৬। ফারুক আলম, 'টিআরএম অনিশ্চিত: সংকটাপন্ন দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল'।

৭। ফারুক আলম, 'মুক্তেশ্বরী নদী'।

৮। আফসার আলী, 'ভৈরব নদের সংস্কার ও খনন: দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভবিষ্যৎ, গণ-কনভেনশনের উত্থাপিত পত্র।

৯। আশরাফ-উল-আলম টুটু, সংকলিত 'খুলনা-যশোর নিষ্কাশন পুনর্বাসন প্রকল্প'।

১০। আফসার আলী, 'ভবদহ জলাবদ্ধতা ও নিরসন প্রস্তাবনা', ভবদহ পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটি আয়োজিত গণ কনভেনশনে উত্থাপিত পত্র।

১১। রাজিব নূর ও মাসুদ আলম, 'ভবদহের জলাবদ্ধতার পদধ্বনি', প্রথম আলো।

১২। মাসুদ আলম, 'ভবদহের কান্না', প্রথম আলো।

১৩। হিউম্যানিটি ওয়াচ, 'ভবদহের সার্বিক পরিস্থিতি'।

১৪। বাবর আলী, 'গোলদার আপার ভদ্রা ও হরিনদী অববাহিকার জলাবদ্ধতা, পরিস্থিতি ও করণীয়'।

১৫। মাসুদ করিম ও দীপক কুমার সরকার, 'পূর্ববিল খুকশিয়ার জোয়ারাধার (টিআরএম) বাস্তবায়ন'।

১৬। হাসেম আলী ফকির, 'হরি অববাহিকায় জলাবদ্ধতায় নিরসন ও টিআরএম বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রস্তাবনা'।

১৭। এম. আর খায়রুল উমাম, 'ভবদহ জলাবদ্ধতার সমস্যা এবং আমাদের করণীয়'।

১৮। প্রগতি সমাজ কল্যাণ সংস্থা।

১৯। দৈনিক প্রথম আলো।

২০। দৈনিক আমাদের সময়।

২১। গ্রাফোস ম্যানের ভূচিত্রাবলী, কেজেডিআরপির প্রকল্প ম্যাপ।

২২। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা। অভয়নগর, মনিরামপুর, কেশবপুর (যশোর)।

২৩। ভবদহ পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটির সভার বক্তব্য এবং যারা ভূক্তভোগী ও মতামত দিয়েছেন এমন অভিজ্ঞজন।

- ইকবাল কবির জাহিদ, রণজীত বাওয়ালী, বৈকুণ্ঠ বিহারী রায়, নাজিমউদ্দিন, জাকির হোসেন হবি, অরুণা চৌধুরী, বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, আঃ হামিদ গাজী, প্রভাষক সুকুমার ঘোষ, প্রভাষক জোবায়ের হোসেন, প্রভাষক চৈতন্য পাল, প্রভাষক তাপস কুমার, মহিরউদ্দিন বিশ্বাস, লিটু মন্ডল বিশ্বাস, অভিমূন্য বাওয়ালী, ইমরান হোসেন, রাকিবুল প্রমূখ।

২৪। মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, 'ভবদহের জলাবদ্ধতা বাস্তবতা ও করণীয়'।